‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের শতবর্ষে বাঙালি মুসলমান

ধর্ম-আলোচনায় কিংবা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তারপরও অনেকে মনে করেন, ধর্ম ও যুক্তি পরস্পরবিরোধী। মনে করা হয়, একই সঙ্গে ধর্ম ও যুক্তিবাদের চর্চা সম্ভব নয়। আসলে এমন ধারণা সঠিক নয়, বরং অসম্পূর্ণ ও অযৌক্তিক। যারা ধর্ম মানেন, পালন করেন তারা যে সবাই যুক্তিবিধর্ম-আলোচনায় কিংবা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তারপরও অনেকে মনে করেন, ধর্ম ও যুক্তি পরস্পরবিরোধী।রোধী, এমন নয়। ধার্মিক ও ধর্মবেত্তা তফসিরকারকদের মধ্যে অনেকেই যুক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন অকপটে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমরা বেশ কয়েকজন যুক্তিবাদী ও মুক্তচিন্তার বাঙালি মুসলমান তরুণের সাক্ষাত পাই যাদের অন্তর্লোক ধর্ম-আধ্যাত্মিকতা ও যুক্তিবাদের আলোয় উদ্ভাসিত ছিল। ১৯২৬ সালে ঢাকায় ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলন নামে যে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সূচনা হয়, তার প্রবক্তা, কর্মী, সংগঠকরা অধিকাংশই ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ অথবা ধর্মজিজ্ঞাসু। এদের মুখপত্র ‘শিখা’র মর্ম শ্লোগান ছিল ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আবুল হুসেন, অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী আনোয়ারুল কাদির, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখ ছিলেন ধর্মবোধসম্পন্ন যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ। এঁদের উদ্যোগ ও নেতৃত্বেই এই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে ওঠে, যাকে অন্নদাশঙ্কর রায় ‘দ্বিতীয় রেনেসাঁ’র সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ আন্দোলনের সংগঠকরা যুক্তি ও ধর্মের সমন্বয়ে একটি যুক্তিনির্ভর জীবনাদর্শ গড়তে যে ত্যাগ স্বীকার করেন তা বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সত্যিই বিরল। এঁদের প্রতিষ্ঠিত ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ (১৯ জানুয়ারি, ১৯২৬) বাঙালি মুসলমান তরুণদের চিত্তে ও চেতনায় বিশাল প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্য-সমাজ চেয়েছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের চিন্তার পরিধিকে বিস্তৃত করতে। অন্ধ সংস্কার, শাস্ত্রাচার, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি থেকে মুসলমান সমাজকে মুক্ত করতে।

কাজী নজরুল ইসলামও এ আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেছিলেন। এক পর্যায়ে আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ও শিখা’র সম্পাদক আবুল হুসেন ও তাঁর সহযাত্রীদের ওপর নেমে আসে মুসলিম রক্ষণশীলতার খড়গ। তাঁদের ধর্মবিরোধী আখ্যা দেওয়া হয়। আবুল হুসেনের ‘আদেশের নিগ্রহ’ প্রবন্ধটি ‘শান্তি’ (আশ্বিন ১৩৩৬) পত্রিকায় প্রকাশের পর তর্ক-বিতর্কের ঝড় ওঠে। আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ে। ‘আবুল হুসেন তখন ঢাকা জজ-কোর্টের উকিল।—- ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর রবিবার “আহসান-মঞ্জিলে আঞ্জুমান অফিসে এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়; সভায়” আবুল হুসেন হুমকীর মুখে এই বলে ‘ক্ষমাপাত্র’ লিখে দেন: “এই প্রবন্ধের ভাষা দ্বারা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মনে যে বিশেষ আঘাত দিয়াছি, সেজন্য আমি অপরাধী।’ (আবুল হুসেনের রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৬৮; পৃ. ‘ভূমিকা’-১৫।) মুসলিম সাহিত্য সমাজের দুই প্রাণপুরুষ আবুল হুসেন ও কাজী আব্দুল ওদুদ ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজে’র কাজ বন্ধ রেখে ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হন। থিতু হন কলকাতায়। পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্যোগের অভাবে ‘শিখা’র দ্যুতি ক্রমশ ফিকে হতে থাকে।

শিখাগোষ্ঠীর সংগঠক-চিন্তক-লেখকরা কেউ নাস্তিক বা ধর্মবিরোধী ছিলেন না। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকারের জীবনাদর্শের আলোকে এঁরা নিজেদের তৈরি করতে চেয়েছিলেন। পাশাপাশি রামমোহন, ডিরোজিও, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, তুরস্কের কামাল আতার্তুক, পারস্যের শেখ সাদি, ফরাসি লেখক-দার্শনিক রোম্যা রোঁলাও তাদের চিন্তাবিশ্বকে আলোড়িত করেছে। সাহিত্যিক ডা. লুৎফর রহমানের সাহিত্যিক চিন্তাধারাও শিখাগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করেছে। ডা. লুৎফরের সাহিত্যচর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন মানুষের অন্তর্নিহিত মহৎ সত্তার বিকাশের মাধ্যমে একটি উন্নতর ও মহত্তর সমাজ বিনির্মাণের। আমাদের সমাজে যখন ধর্ম নিয়ে প্রবল তর্ক-বিতর্ক চলছে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদের রেখাটা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, তখনও তিনি উদার ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের মর্মদর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করতেন, ‘জ্ঞানের দ্বারা মনকে চাষ না করতে পারলে ধর্ম পালন হয় না।’ (রায়হান। লুৎফর রহমান রচনাবলী, পৃ: ১৮২।) তিনি আরও বলেছেন, ‘জীবনকে নির্মল, সত্যময়, সুন্দর, ঈশ্বরের যোগ্য, প্রেমময়, নিষ্পাপ, নির্দোষ করে তোলাই সমগ্র ‘মানবজাতির একমাত্র ধর্ম।..এই সাধারণ ধর্মের নাম আমি ইসলাম দিতে চাই। ইসলাম অর্থ শান্তি, মহাশান্তি।’

শিখাগোষ্ঠীর লেখক ও সংগঠকরা ছিলেন বিশ শতকের তৃতীয় দশকের সবচেয়ে প্রাগ্রসর চিন্তার ধর্মবোধসম্পন্ন মানুষ। অথচ আমরা আজও তাঁদের চিনতে পারিনি। যুক্তিবাদের আলো দিয়ে তারা ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। শিখাগোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ আবুল হুসেন ‘ইসলামের দাবী’ নামক এক প্রবন্ধে নিঃশঙ্কচিত্তে বলেছিলেন, ‘হজরত মোহাম্মদের নামের পূজা ও তাঁর মাহাত্ম্যের অন্ধ মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমাদের জ্ঞানের রাজপথে এসে সাধনা রত হতে হবে, এবং সমাজ জীবনে ‘তাখাল্লাকু বি-আখাবিল্লাহ’ (হজরতের বাণী) সার্থক ও সফল করে তুলতে হবে।’ কাজী আবদুল ওদুদ আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, ‘আল্লার গুণাবলীতে বিভূষিত হও, আল্লার গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়ার অর্থ অনন্ত সদগুণে ভূষিত হওয়া, কাজেই মানুষের উন্নতির অন্ত নেই-।’

এ থেকে বোঝা যায়, মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তক-লেখকগণ মহানবি ও ইসলাম ধর্মকে অন্তর দিয়ে মেনেছেন, অন্ধভাবে নয়। ইসলামকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন স্বচ্ছ ও মুক্তবুদ্ধির আলো দিয়ে, গোঁড়ামি দিয়ে নয়। পারস্যের শেখ সাদি ছিলেন শিখা গোষ্ঠীর লেখকগণের প্রিয় কবি। শেখ সাদির কবিতা কাজী আব্দুল ওদুদকে অনুপ্রাণিত করেছে। মহানবির প্রশস্তিসূচক শেখ সাদির পঙক্তিমালা তিনি বারবার পাঠ করতেন: ‘বালাগাল উলা বে কামালিহি।/ কাশাফাদদুজা বে জামালিহি।’ অর্থাৎ উৎকর্ষে তিনি মহৎ ও মহীয়ান। তাঁর সৌন্দর্যে সব অন্ধকার দূর হয়েছে। মুসলমান সমাজকে কুসংস্কারের অন্ধগলি থেকে জ্ঞানের রাজপথে নিয়ে আসার জন্যই শিখা গোষ্ঠীর সকল সাধনা ও কর্মপ্রয়াস পরিচালিত হয়েছে। বাঙালি মুসলমান সমাজের উন্নয়নে অনেকেই ব্যক্তি পর্যায়ে কাজ করেছেন। কিন্তু শিখাগোষ্ঠীর তরুণদের তৎপরতার মধ্যে ছিল সামষ্টিক চেতনা। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে কেবল স্ব সমাজ ও স্বধর্মের ঋণ শোধ নয়, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যে-ভ্রান্ত ধারণা চালু রয়েছে সেসব ধারণার রাহুগ্রাস থেকেও বাঙালি মুসলমানকে তাঁরা মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। বরং জ্ঞানের আলো জ্বালাতে গিয়ে নিজেরাই পুড়ে মরেছেন।

তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম, মুক্তবুদ্ধির ধর্ম। এ ধর্মে কোনো অন্ধত্ব, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও যুক্তিহীনতা থাকতে পারে না। আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন মহানবি (সা.)-কে পথ-প্রদর্শক, মনুষ্যত্বের আধার, ‘একজন উঁচুদরের যুগ প্রবর্তক মহাপুরুষ’, দিব্যকান্তি সুদর্শন পুরুষ হিসেবে মান্য করেছেন। কিন্তু ইসলামের নামে আচারসর্বস্বতা ও আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি নিয়ে প্রশ্ন করতে দ্বিধা করেননি। আবুল ফজল আরবি ভাষায়

খোতবা পাঠের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আরবে আরবিতে খোতবা পড়া হয়। সেই ধুয়া ধরিয়া আমরাও চলিয়াছি তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া। মনে করি, সুন্নত পালন করিতেছি। আর ভুলিয়া যাই আরবি আরবদের মাতৃভাষা, আরবি তাহারা বুঝে, আমরা তাহা বুঝি না অথচ পুণ্যলাভের দুরাশায় বুঝিবার ভান করিয়া হাহুতাশ করিয়া বুক ভাসাই।’ (তরুণ আন্দোলনের গতি, শিখা, তৃতীয় বর্ষ, ১৯২৯। পৃ:১৩৭)

সাধারণ মানুষ যাতে কোরআন ভালভাবে বুঝতে পারে, সেজন্য কাজী আবদুল ওদুদ পবিত্র কোরআন বাংলায় অনুবাদ করেন। অনুবাদের ক্ষেত্রেও তিনি স্বকীয়তার পরিচয় দেন। ধর্মচর্চাকে তিনি ‘আদর্শের বা শ্রেষ্ঠ চিন্তার আনুগত্য’ বলে মনে করেছেন। তারপরও সারাজীবন আবেগের চেয়ে যুক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ‘হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম’ গ্রন্থে ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন: ‘একালের ধর্ম বলতে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সাধনাই মুখ্যভাবে বুঝতে হবে—ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের দিক তার তুলনায় গৌণ,—জীবনে কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ এই বিচার আমাদের মধ্যে যেন কখনো শিথিল না হয়, বিশেষ করে একালের জটিল জীবনায়োজনের দিনে।’ (হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম, কলিকাতা, ১৩৭৩। পৃ: ৩০৫) অন্যদিকে, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, মোতাহার হোসেন চৌধুরী প্রমুখ ধর্মকে যুগের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

তাঁরা মনে করতেন, বাঙালি মুসলমান বহুকাল থেকেই যুগধর্ম উপেক্ষা করে সৃষ্টিশীলতার পথ থেকে দূরে সরে গেছে। মুসলমান সমাজের ধর্ম সম্পর্কিত উপলব্ধি মোতাহার হোসেন চৌধুরীকে ভীষণভাবে হতাশ করেছে। তাঁর মনে হয়েছে, এ সমাজ ধর্মকে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই এরা সৎ, সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দময় জীবনযাপন করতে পারছে না। আচারিক ধর্মের ডোবাতে হাবুডুবু খাচ্ছে বলে আমাদের সমাজ ক্রমশ ধর্মান্ধ হয়ে উঠছে। প্রজ্ঞার অভাবে গভীর ধর্মবোধসম্পন্ন মানুষও তৈরি হচ্ছে না। অথচ প্রকৃত ধর্মবোধ ছাড়া ধর্মের মর্মমূলে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন:

‘.. শাস্ত্র পঠনের আবশ্যকতা তার থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবার জন্যই, তাকে হুবহু নকল করবার জন্য নয়। .. শাস্ত্রকে উপেক্ষা করতে বলছিনে, মানুষকে শাস্ত্রের কাজে না লাগিয়ে, শাস্ত্রকে মানুষের কাজে লাগানোর কথা বলছি। অন্তরের অন্তস্তল হতে উৎসারিত প্রেম আর সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপী অখণ্ড অদ্বৈতের অনুভূতিই ধর্ম।’

পশ্চাৎপদ ও দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নিতেই ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজে’র অভ্যুদয়। সেই সঙ্গে ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের শুভ সূচনা। এ আন্দোলনের লেখক-সংগঠকরা ধর্ম ও যুক্তিকে পাশাপাশি রেখে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কালের বৈরী প্রতিক্রিয়া পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেছে। যে-স্বপ্ন নিয়ে তাদের যাত্রা, তা মাঝ পথেই বাধার সম্মুখীন হয়। ফলে তাদের কোনো স্বপ্নই পূরণ হয়নি।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, গত শতকের ত্রিশ দশক পর্যন্তও বাঙালি মুসলমান-সমাজ শিখাগোষ্ঠীর মুক্ত, স্বচ্ছ, প্রাগ্রসর চিন্তা ধারণ করার জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা ও পরিপক্বতা প্রয়োজন, সেটা তাদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু শিখাগোষ্ঠীর লেখকরা ধর্ম ও যুক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ইসলাম ধর্মের একটি যুক্তিসিদ্ধ ও শাশ্বত রূপ সাধারণের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ধর্ম ও যুক্তিকে দুই বিপরীত মেরুতে দাঁড় করিয়ে ধর্মযুদ্ধ করতে চাননি। আধুনিক বাঙালি মুসলমানকেও ধর্ম ও যুক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব না বাধিয়ে, বরং উভয়ের মধ্যে সার্থক সংলাপের আয়োজন করেই অগ্রসর হতে হবে। পশ্চিমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলেও যুক্তির ছায়ার নিচে আশ্রয় নিতে হবে। হিংসায়-উন্মত্ত, দ্বন্দ্ব মুখর পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারস্পরিক সমঝোতা ও যুক্তিসিদ্ধ আলাপ-আলোচনার আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না।

লেখক ও প্রবান্ধিক। উপাধ্যক্ষ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, মেহেরপুর।

পারিবারিক শিক্ষা বনাম রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়: একটি বৌদ্ধিক বিপ্লবের ইশতেহার

সূচনার প্রেক্ষাপট: মহীরুহ বনাম শেকড়ের রসায়ন

একটি রাষ্ট্র যদি একটি বিশাল মহীরুহ হয়, তবে পরিবার হলো তার

প্রাণদায়ী শেকড়। আমরা যখন একটি গাছের ডালপালা শুকিয়ে যেতে দেখি বা ফলকে বিষাক্ত হতে দেখি, তখন বুঝতে হবে সমস্যাটি ওপরের নয়, বরং মাটির গভীরে শেকড়ে পচন ধরেছে। বর্তমান বাংলাদেশে আমরা রাষ্ট্রীয় যে অবক্ষয়, নৈতিক স্খলন কিংবা দুর্নীতির মহোৎসব দেখছি, তা আকাশ থেকে পড়া কোনো পঙ্গপাল নয়; বরং এটি আমাদের পারিবারিক শিক্ষার চরম সংকটের এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্র কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়; বরং রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক একেকটি পরিবারের প্রতিনিধি। যখন পরিবার তার নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পাঠ দিতে ব্যর্থ হয়, তখন রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তম্ভে ধস নামা অনিবার্য।

অন্দরমহলের দায়বদ্ধতা: নৈতিকতার প্রথম পাঠশালা

মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, একটি শিশুর চরিত্রের ৭০ শতাংশ গঠিত হয় তার জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে—যা সে পরিবার থেকে শেখে। অথচ আধুনিক অন্দরমহলগুলো আজ নৈতিকতার চেয়ে বস্তুগত অর্জনে বেশি মনোযোগী। একটি রাষ্ট্র যখন নৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ে, তখন বুঝতে হবে সেই রাষ্ট্রের পরিবারগুলো ভেতর থেকে ক্ষয়ে গেছে। আমরা যখন বড় বড় দুর্নীতিবাজদের ফাঁসি চাই, তখন আমরা ভুলে যাই যে সেই চোরটি একদিন কোনো না কোনো ঘরে বড় হয়েছে। যে মা-বাবা সন্তানকে অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে শেখান, তারাই পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ স্বৈরাচার তৈরি করছেন। রাষ্ট্রকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড় করাতে হলে প্রতিটি ঘরকে হতে হবে এক একটি ‘নীতিবিদ্যার ল্যাবরেটরি’।

চুরির হাতেখড়ি: পেন্সিল থেকে মেগা প্রজেক্ট

দুর্নীতির শেকড় কিন্তু সচিবালয়ে নয়, বরং শুরু হয় ডাইনিং টেবিল থেকে। শৈশবে যখন একটি শিশু অন্য সহপাঠীর পেন্সিল বা টিফিন বক্স চুরি করে বাড়ি ফেরে এবং মা-বাবা তাকে শাসন না করে ‘বুদ্ধিমান’ বা ‘চালাক’ বলে প্রশ্রয় দেন, ঠিক ওখান থেকেই শুরু হয় রাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনের প্রথম পাঠ। যে হাত শৈশবে অন্যের হকে ভাগ বসাতে আনন্দ পায়, সেই হাতই বড় হয়ে রাষ্ট্রের হাজার কোটি টাকার মেগা প্রজেক্টের বাজেট গিলে ফেলে। এই চারিত্রিক স্খলনের দায় রাষ্ট্রের চেয়ে পরিবারেরই বেশি। কারণ, পরিবার যদি শৈশবেই ‘সততার আভিজাত্য’ শেখাত, তবে রাষ্ট্রীয় আমলা বা রাজনীতিবিদরা লোভের কাছে মাথা নত করতেন না।

মেকি জিপিএ-৫ বনাম মানবিক বিবেক: সাফল্যের এক ভ্রান্ত ধারণা

নাগরিক আসার কোনো সুযোগ থাকে না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্যের চরিত্র হনন করার যে পৈশাচিক আনন্দ আজ তরুণদের মাঝে দেখা যায়, তা আসলে তাদের পারিবারিক শিক্ষারই এক ধরণের নেতিবাচক প্রতিফলন।

রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়: যেখানে নিয়মই অনিয়ম

রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিচারহীনতা এবং দুর্নীতির যে জয়জয়কার আমরা চারপাশে দেখি, তা একদিনে তৈরি হয়নি। রাষ্ট্রীয় এই অবক্ষয় আসলে লক্ষ লক্ষ পরিবারের ব্যর্থতার এক সামষ্টিক ও বীভৎস রূপ। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি কলকব্জা যখন ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে, তখন বুঝতে হবে সেই চালকদের পারিবারিক বুনন ছিল নড়বড়ে। যখন একজন অভিভাবক তার সন্তানকে শেখান ‘যেকোনো উপায়ে জয়ী হওয়াই বীরত্ব’, তখন সেই সন্তান বড় হয়ে রাষ্ট্রকে লুটপাট করতে দ্বিধা করে না। আদর্শিক নেতৃত্ব আকাশ থেকে পড়ে না; তা তৈরি হয় প্রতিটি ঘরের পড়ার টেবিলে এবং মা-বাবার জীবনাচরণে। পরিবার যখন তার সন্তানদের দেশপ্রেমের চেয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোগবাদ বেশি শেখায়, তখন রাষ্ট্র তার নৈতিক অভিভাবকত্ব হারায়।

বৌদ্ধিক বিপ্লব: সংস্কারের শুরু হোক ঘর থেকে

আমরা প্রায়ই রাজপথে বিপ্লবের কথা বলি, রাষ্ট্র সংস্কারের স্লোগান দিই; কিন্তু আসল বিপ্লবটা হতে হবে আমাদের মনস্তত্ত্বে। এই বৌদ্ধিক বিপ্লবের প্রথম ধাপ হতে হবে প্রতিটি পরিবারের অভ্যন্তরে। রাষ্ট্রীয় সংস্কার কোনো ওপরতলার প্রশাসনিক হুকুম বা আইনি কাঠামো দিয়ে স্থায়ীভাবে সম্ভব নয়, যতক্ষণ না নাগরিকের চারিত্রিক ভিত্তি মজবুত হয়। নৈতিকতা, সত্যবাদিতা এবং পরমতসহিষ্ণুতার যে শিক্ষা আমাদের পরিবারগুলো থেকে হারিয়ে গেছে, তা পুনরুদ্ধার করাই হোক এবারের সংগ্রাম। রাষ্ট্রকে দোষারোপ করার আগে আমাদের আয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে এবং দেখতে হবে আমরা প্রতিটি ঘর থেকে সমাজকে কেমন মানুষ উপহার দিচ্ছি।

উপসংহার: আগামীর দায়বদ্ধতা ও প্রতিরোধের দুর্গ

পারিবারিক শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা একে অপরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটি অচল। আমরা যদি আগামীর সুন্দর একটি বাংলাদেশ বা একটি মানবিক সমাজ বিনির্মাণ করতে চাই, তবে পরিবারকে তার আদি পরিচয়ে ফিরে যেতে হবে—অর্থাৎ একটি ‘নৈতিক পাঠশালা’ হিসেবে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়ের এই করাল গ্রাস থেকে

বাঁচতে পরিবারকেই হতে হবে নৈতিক প্রতিরোধের প্রথম দুর্গ। মনে রাখতে হবে, সমাজ বা রাষ্ট্র পরিবর্তনের চাবিকাঠি কোনো নেতার হাতে নয়, বরং প্রতিটি সচেতন মা-বাবার হাতে। ঘরের দেয়ালগুলো যদি সততার পাঠ দিতে শুরু করে, তবে রাষ্ট্রের রাজপথগুলো এমনিতেই কলঙ্কমুক্ত হবে।

গ্রামের অতীত স্মৃতি

বিধাতা বানাতে চায় উদার প্রকৃতি বন-বনান্তর গাছ-পালা মানুষ। আর মানুষ বানাতে চায় স্বর্গ পাথর নির্মিত প্রসাদ নাম দেয় শহর। সেখানে কি পায় তারা? বরং হারায় বেশি। কথা গুলো আমার নয়।

বয়সে প্রবীণ এক দাদার কাছে জানতে চেয়েছিলাম গ্রামের অতীত কথা। চরম এক ভাবাবেগে তিনি একটানে বলেছিলেন কথা গুলো এবং এ নিয়ে তিনি আরো যে স্মৃতিচারণ করেছিলেন তাইই আপনাদের কাছে জানাবার প্রয়াস পাচ্ছি। তিনি বলেছিলেন গ্রামের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের কথা, আমগাছ, জামগাছ, তাল-তরমুজ, সরষে ক্ষেতের রূপের কথা। সবুজ শ্যামলীময় ঘেরা হাজার-খানেক মানুষের বসতীর কথা। মুক্ত আকাশ সতেজ হাওয়া গ্রামবসীর সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের কথা। নানামুখি এবং নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠান যা ছিল গ্রামের সুখ সমৃদ্ধির একান্ত উপমা। বর্ণনা করেছিলেন পাশেই বয়ে চলা নদীর কথা যা গ্রমের রূপ মাধুর্য্যকে আরো বর্ধিত করেছিল। আমিও সেই রূপ বর্ণনার সাথে মনের মাধুরী মিশিয়ে এক ঝলক কল্পনা করে নিয়েছিলাম পল্লী কবি জসিম উদ্দীনের ‘নিমন্ত্রণ’ কবিতার দুটি লাইন-
“তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়
গাছের ছায়ায় লতায়-পাতায় উদাসী বনের বায়”

সে সবই আজ যেন কিংবদন্তী। সেদিনের সে সুখ-সমৃদ্ধি আজ ম্লান হয়ে পড়ে আছে স্মৃতির পাতায়। দিন যায় মাস পেরিয়ে বছর এমনি করে বদল হয় যুগের। বৃদ্ধি পায় মানুষ বুদ্ধি আসে মাথায় প্রয়োজন পড়ে উন্নতির । সে প্রয়োজনকে ভূয়সী মান্যতায় ভূষিত করা হয় ‘পল্লী উন্নয়ন অবকাঠামো’ নামে। আসে প্রগতি সে আশির্বাদে পুষ্ট হয় কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব। আসে কৃষি যন্ত্রপাতি সেচ সার কীটনাশক। আর ধীরে

পাগলামীতে যে নদীর সৃষ্টি হয়েছিলো কোনো অতীতে সেই প্রকৃত উচ্ছাস আর চোখে পড়েনি। স্রোতহীন নিথর দেহ নিয়ে ভৈরবের বুকে এখন শুধুই দীর্ঘশ্বাস।

আমি আমার শিশু-শৈশব কাল থেকে এ অবধি গ্রামে হিন্দু-মুসলিম দু- ধরনের সম্প্রদায়ের লোকজনকে একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে দেখেছি। এদের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক ঝামেলা প্রকট হতে দেখিনি। তবে গ্রামটির নামকরণের বিষয়ে অনেকখানি গোলমেলে মনে হয়। বিশেষ সূত্রে জানা যায় মোনাখালীর উত্তরপাড়ার প্রাচীন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দক্ষিণপাড়ার পূজা মন্দিরের গাত্র ফলকে গ্রামের নাম হরেকেষ্ট পুর লেখা ছিল।

পরবর্তীতে পুরোনো আমলের অনেক কাগজ পত্রাদিতেও নাকি ‘মনিখালি’ নাম অভিহিত হতে দেখা যায়। অনেকে মনে করেন ‘মনিখালি’ নামের অপভ্রংশের কারণেই হয়তোবা মোনাখালীতে রূপ নিতে পারে। প্রশ্ন জাগে, হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনো এক ইষ্ট দেবতার নাম ‘হরেকেষ্ট’ কে অতিক্রম করে কিভাবে মনিখালিতে রুপ নিয়েছিলো উত্তর পাইনি দাদার কাছেও। প্রশ্ন রইলো সময়ের কাছে। যদি জানা যায় ভবিষ্যতে কোনোদিন জানাবার প্রত্যাশা রইলো।

লেখকঃ কবি ও সাহিত্যিক

হিমালয় কন্যা নেপাল ভ্রমণ

সমুদ্র মনকে প্রশস্ত করে আর পাহাড় আমাদের প্রকৃতির খুব কাছে নিয়ে যেতে পারে। পাহাড়ের নিস্তব্ধতা মনের সব ক্লান্তি দূর করে। এবারের লেখাটি হিমালয় কন্যা নেপাল ভ্রমণ নিয়ে।

আমি আল্লাহর রহমতে জাহাজ নিয়ে ৭০ টির অধিক দেশে গিয়েছি এবং পৃথিবীর অধিকাংশ সাগর, মহাসাগর পাড়ি দিয়েছি। নেপাল ভ্রমণটি জাহাজ নিয়ে নয় বরং এটি ছিল আমার হানিমুন ট্রিপ। আমার সহধর্মিনীকে নিয়ে নেপাল ভ্রমণে গিয়েছিলাম বিমানে চড়ে। নেপালে কোন সমুদ্র নাই তাই হয়তো এর আগে যাওয়া হয় নাই। আমরা ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে নেপাল ভ্রমণে যাই। ঢাকা থেকে বাংলাদেশ

এটি হনুমান ধোকা দরবার ক্ষেত্র নামেও পরিচিত। শিল্পকর্মগুলো সত্যিই খুব নিখুঁত এবং সুন্দর বলে মনে হয়েছে।

পর্যটকদের জন্য অক্টোবর- নভেম্বর এবং মার্চ-এপ্রিল সবচেয়ে ভালো সময়।

কাঠমান্ডুতে অন্যতম কয়েকটি শপিং মলের মধ্যে রয়েছে সিভিল মল, সিটি সেন্টার ইত্যাদি। সিভিলমলে রয়েছে কাপড়ের দোকান,ইলেকট্রনিক্স এবং ফুড কোট। এছাড়া বিভিন্ন রকম ব্র্যান্ডেড জিনিসপত্রের জন্য সিটি সেন্টারটি জনপ্রিয়। এছাড়াও খুচরা কেনাকাটার জন্য পিপলস প্লাজাটি ভালো। এখানে আন্তর্জাতিক পণ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প পাওয়া যায়। আমরাও ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু শপিং এবং খাওয়া-দাওয়া করেছিলাম।

কাটমান্ডু থেকে পোখারার দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। যেতে প্রায় ৭ থেকে ৮ ঘন্টা সময় লাগে। আমরা টুরিস্ট বাসে কাঠমান্ডু থেকে পোখারা গিয়েছিলাম।

কাঠমান্ডু থেকে পোখারার রাস্তা অনেকটা রোমাঞ্চকর অভিযানের মতোই। পাহাড় কেটে কেটে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। যাত্রাপথে সবুজ পাহাড়, মনোরম গ্রাম, এবং ঝরে পড়া জলপ্রপাতসহ চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। রাস্তাটি আঁকাবাঁকা পাহাড় ও পর্বতের মধ্য দিয়ে চলে গেছে যেখান থেকে অন্নপূর্ণা ও ধুলাগিরি সহ হিমালয়ের বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যায়। যেতে যেতে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা যায়। এছাড়াও যাত্রাপথে পড়ে মনোকামনা মন্দিরসহ ও বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী স্থান যা টুরিস্টদের আকর্ষণ করে। পাহাড়ের উপর থেকে শহর ও গ্রাম গুলোকে খুব সুন্দর দেখা যায়। তবে রাস্তাগুলোতে চলার সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করার দরকার অন্যথায় বড় রকম বিপদের আশঙ্কা থেকে যায়। তবে ভারী বর্ষণের সময় এইসব রাস্তা দিয়ে চলাচল করা খুবই বিপদজনক কারণ হঠাৎ করে পাহাড়ের কিছু অংশ ভেঙে পড়লে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

পোখারা নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পর্যটন কেন্দ্র। এটি কাঠমান্ডু থেকে ২০০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। এটি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত হ্রদ ও পর্বতের অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য পরিচিত, যার মধ্যে হ্রদ অন্যতম। এটি প্যারাগ্লাইডিং ও ট্র্যাকিংয়ের জন্য জনপ্রিয়। এছাড়াও পোখারা কে হ্রদের শহর ও বলা হয়। এখানকার প্রধান আকর্ষণ হল সারংকোট।

দেখতে গিয়েছিলাম। কেবলকারে উঠে হিমালয় পর্বতমালা দেখা যায়। অনেকেই দেখলাম মুরগি,ছাগলসহ বিভিন্ন উপঢৌকন নিয়ে মন্দিরটিতে গিয়েছে। স্থানীয় লোকজন বিশ্বাস করে দেবী তার ভক্তদের মনোকামনা পূরণ করেন।

পোখারা প্রাকৃতিক বৈচিত্রের জন্য চমৎকার একটি জায়গা। যেকোনো দর্শনার্থীকেই মুগ্ধ করবে এই শহরটি। পরবর্তীতে আমরা পোখারা থেকে টুরিস্ট বাসে কাঠমান্ডু ফিরে আসি এবং দুইদিন কাঠমান্ডুতে অবস্থান করে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে ঢাকা ফিরে আসি।

তবে নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ বিমানবন্দর হিসাবে পরিচিত যা ভৌগলিক অবস্থান, ঘন কুয়াশা এবং উঁচু পাহাড়ের কারণে চ্যালেঞ্জিং। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৪০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এবং ৮৭০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের খুব কাছে হওয়ায় এখানে অবতরণ পাইলটদের জন্য অত্যন্ত সতর্কমূলক কাজ। বিমানবন্দরটি ৪৪০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত যার ফলে এখানে রানওয়ে ছোট মনে হয় এবং বিমান থামানোর জন্য পাইলটদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হয়। এছাড়াও এখানে সর্বশেষ ২০১৮ সালে এবং অতীতে বেশ কয়েকটি বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই এই বিমানবন্দরটিকে অনেকেই বিশ্বের অন্যতম বিপদজনক বিমানবন্দর হিসেবে গণ্য করেন।

নেপালের একটি পবিত্র স্থান হল গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী যা বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম নেপালের তেরাই অঞ্চলে অবস্থিত। এই পবিত্র স্থানে রানী মায়াদেবী খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সিদ্ধার্থ গৌতমকে (গৌতম বুদ্ধ) জন্ম দিয়েছিলেন। এই স্থানটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃত। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন মহান আধ্যাত্মিক গুরু। তিনি অহিংসা এবং ত্যাগের শিক্ষা দিয়ে বিশ্বব্যাপী মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

মাস্টার মেরিনার,(এ এফ এন আই)

এক্স ক্যাডেট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি চট্টগ্রাম।

মেহেরপুর প্রতিদিনের ৯ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দিনব্যাপী বণার্ঢ্য আয়োজন













Oplus_153223168



Oplus_153223168



Oplus_153223168





মেহেরপুর প্রতিদিন: ঐতিহ্যের ধারায় সাহসী অগ্রযাত্রা

মেহেরপুরের মাটি, ইতিহাস ও মানুষের কথা তুলে ধরার এক অনন্য প্রয়াস হিসেবে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন আজ ৯ম বছরে পদার্পণ করেছে—এ এক গৌরবের মুহূর্ত, শুধু একটি পত্রিকার জন্য নয়, বরং পুরো অঞ্চলের জন্য।

একটি অবহেলিত ও সম্ভাবনাময় জনপদ থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে সাহস, শ্রম ও দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রকাশক এম.এ.এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুব চান্দুসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টায় এই পত্রিকাটি আজ মেহেরপুরের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ অঞ্চলের মানুষের আস্থা ও ভালোবাসার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

মেহেরপুরে সংবাদপত্রের ইতিহাস একদিনে গড়ে ওঠেনি। ‘সাধক’, ‘পল্লী শ্রী’, ‘সীমান্ত’, ‘প্রবাহ’ থেকে শুরু করে সাপ্তাহিক ও অনিয়মিত নানা প্রকাশনা এই অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার ভিত তৈরি করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন আজ একটি স্থিতিশীল ও বিশ্বাসযোগ্য অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এটি শুধু সংবাদ পরিবেশনেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ ও মানুষের গল্প তুলে ধরে এক প্রজন্মকে শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যেখানে অনেক সামর্থ্যবান ব্যক্তি

উদ্যোগ নেননি, সেখানে একজন তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে এম.এ.এস ইমন সাহস করে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং তা সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

পত্রিকাটির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, উপস্থাপনার সৌন্দর্য, সাহিত্য ধারা এবং বস্তুনিষ্ঠতা পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। ‘মুক্তকথা’ অনুষ্ঠানের মতো উদ্যোগও স্থানীয় পর্যায়ে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রকাশক ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল ও ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক চান্দুর সাহসী পথচলা মেহেরপুরের সংবাদপত্রের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই।দোয়া রইল তাদের জন্য।এগিয়ে যাও মেহেরপুরবাসীকে সাথে নিয়ে। আমরা তোমাদের সাথে আছি।

একথা সত্য যে, মেহেরপুরের মতো ছোট ও কৃষিনির্ভর এলাকায় একটি দৈনিক পত্রিকা টিকিয়ে রাখা সহজ কাজ নয়। কিন্তু প্রতিকূলতা জয় করেই মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে চলেছে—এটাই এর সবচেয়ে বড় শক্তি।

এই শুভক্ষণে প্রত্যাশা—পত্রিকাটি আরও সমৃদ্ধ হোক, আরও নির্ভীক ও বস্তুনিষ্ঠ হোক, মানুষের কথা বলুক, সত্যের পক্ষে থাকুক।
পরিশেষে বলা যায়,এগিয়ে যাক দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন,এগিয়ে যাক মেহেরপুরের গণমাধ্যম, এগিয়ে যাক এই অঞ্চলের মানুষ, সংস্কৃতি ও সম্ভাবনা।

মুহাম্মদ রবীউল আলম: লেখক-সাংবাদিক।ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী

নবম বর্ষে মেহেরপুর প্রতিদিন

২৬ মার্চ নবম বর্ষে পদার্পণে জেলার একমাত্র আয়না ও মুখপত্র ‘ ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’’ পত্রিকার পরিবারকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ থেকে নয় বছর আগে মেহেরপুর প্রতিদিন নামক কাগজটি জন্ম নিয়ে

অনেক চড়ায় ঊৎরায় ও বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আট বছর সফল ভাবে পার করেছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের ঐতিহাসিক পটভূমিতে সবচেয়ে ছোট্ট জেলা মেহেরপুর হলেও ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি দখল করে আছে। শত বছরের প্রতীক্ষার স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম জনযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের তীর্থ স্থান, প্রথম রাজধানী, প্রথম সরকার গঠন, শপথ গ্রহণ এবং নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পরিচালিত হয় এই মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। নানা কারণেই আমাদের ছোট্ট জেলাটি সারা দেশে এক ঈর্ষণীয় স্থান দখল করে আছে। কিন্তু একটি কাগজের অভাবে আমরা জানাতে পারতাম না আমাদের অর্জনের কথাগুলো। মেহেরপুর প্রতিদিনের জন্মের পর আমরা সেই অভাব কিছুটা হলেও মিটাতে পেরেছি।

মেহেরপুরের উর্বর মাটি শুধু ইতিহাসের সাক্ষী নয়, এটি প্রতিরোধের, প্রতিবাদের এবং সত্যের প্রতিক। এই মাটিতে জন্ম নিয়েছে সাহসী কন্ঠ সাহসী কলম যোদ্ধা আর সেই কন্ঠের আধুনিক রূপ একটি দৈনিক পত্রিকা ‘‘মেহেরপুর প্রতিদিন’’ । এর নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের উৎসব নয়, এটি সত্য প্রকাশের উন্নয়নের দিক নির্দেশনামূলক এক নিরন্তর যাত্রার মাইলফলক। প্রতিদিনই ইতিহাসের দালিলিক প্রমাণ পত্র হয়ে থাকছে। ‘ ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’’ গত নয় বছরে প্রমাণ করেছে একটি স্থানীয় পত্রিকা একটি জেলার জন্য কতটা প্রয়োজন এবং কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি সকালে মেহেরপুরের মানুষ প্রিয় কাগজ মেহেরপুর প্রতিদিনে চোখ বুলিয়ে যে যার কাজে যায়।

সীমিত সামর্থ, সীমিত সম্পদ অন্যদিকে সীমাহীন চ্যালেঞ্জ তবুও তারা থেমে যায়নি। কারণ তাদের কাছে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা শুধু পেশা নয় এটি একটি পবিত্র আমানত পবিত্র দায়িত্ব, দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং প্রতিশ্রুতি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কলমের মূল্য পাঁচ টাকা হলেও দায়িত্বের চেয়ারে এর মূল্য অসীম। শহীদের রক্তের চেয়ে কলমের কালি দামি মেহেরপুর প্রতিদিন তা ভুলে যায়নি। সুন্দর জাতি রাষ্ট্র পৃথিবীর জন্য যেসব গণমাধ্যম কলম যোদ্ধা শব্দ যোদ্ধা সাংবাদিক সব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে অবদান রেখেছেন এবং রেখে চলেছেন জীবনদান করেছেন পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, পরিবার পরিজন ও সম্পদ হারিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই। বহু প্রাচীন সভ্যতা একটি অংশ জ্ঞানচর্চা। এই জ্ঞানচর্চা কালের বিবর্তণে বহুরূপে প্রচারিত এবং প্রকাশিত মানবিক সেবার সবচেয়ে

জনপ্রিয় আস্থার মাধ্যম হিসেবে স্থান করে নিয়েছে বিশ্ব গণমাধ্যম। সেখানেও যুক্ত হয়েছে মেহেরপুর প্রতিদিন। মেহেরপুর প্রতিদিন কতৃপক্ষ কোনদিন অন্যায়ের সাথে আপোষ করেনা।

যুগে যুগে একটি সুন্দর পৃথিবী স্বাভাবিকভাবে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার করা সহজ হলেও সত্যিকারের সমাজ পরিবর্তন, দেশ ও জাতি গঠনের এবং মানবিক বিশ্বের জন্য সংবাদ মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রকৃত সাংবাদিক হওয়া অনেক কঠিন দায়িত্বের এবং চ্যালেঞ্জের। সাংবাদিকতার পূর্ব শর্ত একজন সাংবাদিককে অধ্যাবসায়ী, সময়ের মূল শিক্ষানুরাগী, সাহসী, প্রতিবাদী, সৎ, বিনয়ী, ধৈর্যশীল, শৃঙ্খলা, গভীর মানবতা প্রেমী, ত্যাগী বিশ্বাসী সর্বপরি অনেক জ্ঞান সম্পন্ন হতে হয়। তাঁকে বুঝতে হবে তার পবিত্র কলমের মর্যাদা ও সম্মান। জনকল্যাণই হবে মুখ্য বিষয়। এখানে বীরোচিত সম্মান আছে কিন্তু অঢেল অর্থ সম্পদ নেই। জেনে শুনে বুঝে এই পেশায় আসা উচিত।

সবার জন্য গণমাধ্যম এবং রাজনীতি নয় কিন্তু আমাদের দেশে পুরোটাই উল্টো! আমরা এখনও ব্যক্তি দল সংগঠন প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কেন্দ্রিক সমালোচনা করতে শুনতে স্বাগত এবং দুঃখিত বলতে খুব একটা অভ্যস্ত নয়। দায়িত্বের চেয়ার গুলো বৃদ্ধি পেলেও দায়িত্ব বোধ সেভাবে বাড়ছে না। বেড়েছে আইন, কমেনি অপরাধ। মহান রাজনীতি আজ মাঠে নেই, পকেটে যার ফলে সুনীতির জন্য হাজার কোটি টাকার কার্য্যক্রম চললেও আজো দুর্নীতিকে রুখে দিতে পারেনি। রাষ্ট্রের মহাজন জনগণ এখন পরাধীন, চাকরের ভূমিকায় পবিত্র কলম, পবিত্র শপথ । পবিত্র পোশাক, পবিত্র চেয়ার কেন আজ শ্রদ্ধাহীন, অবিশ্বাস এবং বিতর্কিত? নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলে জেনে শুনে অপরাধ মেনে নিচ্ছি এবং দূর্নীতিকে উৎসাহিত করছি। সময় এসেছে নতুন প্রজন্মের কাছে নতুনভাবে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রের সফলতা বিফলতার চিত্র তুলে ধরার। আর সে দায়িত্ব কিছুটা হলেও স্থানীয়ভাবে তুলে ধরছে আমাদের প্রিয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন কাগজটি।

‘ ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’’ এর নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমাদের অঙ্গিকার হোক *কলম বিক্রি হবে না *সত্য চাপা পড়বে না *অন্যায়ের সাথে আপোষ হবে না *ক্ষমতার সামনে মাথা নত করা যাবে না *জনতার মুখপাত্র হিসেবে আপোষহীন পথ চলা। ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী, কর্ম চিরস্থায়ী এবং ইতিহাসে দালিলিক প্রমাণপত্র হয়ে থাকবে আমাদের প্রিয় মেহেরপুর প্রতিদিন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে।

২৬ মাচর্ মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিষ্ঠার দিনে প্রত্যাশা করি তার

আদর্শকে লালন করে বেঁচে থাকবে যুগযুগ সত্য ন্যায়ের প্রতীক হয়ে।

একটি পত্রিকা, একটি প্রভাতের প্রতিশ্রুতি

নবাবী আমলের শেষ সূর্যোদয় হয়েছিল পলাশীর আম্রকাননে— সেটি ছিল এক যুগের অবসানের প্রতীক। সেই সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি অধ্যায় চিরতরে নিভে যায়। কিন্তু ইতিহাস কখনো শূন্যতায় থেমে থাকে না। সময়ের স্রোত নতুন প্রভাতের জন্ম দেয়।

বহু বছর পর, সেই বাংলার বুকেই আবার সূর্য ওঠে— এবার স্বাধীনতার, আত্মমর্যাদার, জাতিসত্তার সূর্য। সেই সূর্যোদয়ের পুণ্যভূমি মুজিবনগর। মুজিবনগরের আম্রকানন— একটি নাম, একটি স্থান, অথচ তার ভেতরে লুকিয়ে আছে একটি জাতির পুনর্জন্মের ইতিহাস। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল, দগ্ধ-রক্তাক্ত এক সময়ের মধ্যে এখানেই শপথ নেয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। সেই শপথ ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়; ছিল প্রতিজ্ঞা, ছিল সংগ্রামের অঙ্গীকার, ছিল স্বাধীনতার অগ্নিশপথ। যুদ্ধক্ষেত্রে তখন গর্জে উঠছে বন্দুক, চারদিকে অনিশ্চয়তা, তবুও সেই সরকার নেতৃত্ব দিয়েছিল নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকে— একটি জাতিকে পৌঁছে দিয়েছিল বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে।

মেহেরপুর জেলা— নিরীহ, কৃষিনির্ভর, শান্ত এক জনপদ। এই মাটিতে ধানের শিষ দোলে, কৃষকের ঘামে সিঞ্চিত হয় জীবনের চক্র। কিন্তু এই সরলতার আড়ালেই লুকিয়ে আছে গভীর ইতিহাস, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের কাহিনি। এখানকার মানুষ যেমন জমিতে ফসল ফলায়, তেমনি সময়ের প্রয়োজন হলে ইতিহাসও রচনা করে। আর সেই ইতিহাসকে ধরে রাখার, লালন করার এবং নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম— সংবাদপত্র। মেহেরপুর জেলায় সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল “পরিচয়” দিয়ে। নামের মধ্যেই ছিল এক ধরনের আত্মপরিচয়ের সন্ধান। সেই পত্রিকা ছিল সময়ের দর্পণ, সমাজের ভাষ্যকার। সময় বদলেছে, মাধ্যম বদলেছে, কিন্তু মানুষের কথা বলার প্রয়োজন কখনো

বদলায়নি। সেই ধারাবাহিকতায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ‘আমাদের সূর্যোদয়’ এবং ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এই দুই পত্রিকা জেলার মানুষের কথা বলার দায়িত্ব বহন করছে। এর মধ্যে মেহেরপুর প্রতিদিন একটি বিশেষ অবস্থান তৈরি করেছে। ২৬ মার্চ পত্রিকাটি আট বছরপূর্তী। ২৭ মার্চ নয় বছরে পদার্পণ করেছে।

আট বছর— সময়ের হিসাবে হয়তো দীর্ঘ নয়, কিন্তু একটি জেলা-ভিত্তিক পত্রিকার জন্য এটি এক বিশাল অর্জন। কারণ একটি পত্রিকা টিকিয়ে রাখা মানে শুধু ছাপাখানার কালি আর কাগজ নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম, পেশাগত চ্যালেঞ্জ, সামাজিক চাপ এবং অনেক সময় রাজনৈতিক প্রতিকূলতাও। একটি পত্রিকা যখন পথচলা শুরু করে, তখন তার সামনে থাকে হাজারো অনিশ্চয়তা। পাঠক পাবে কি না, বিজ্ঞাপন আসবে কি না, সত্য প্রকাশের সাহস ধরে রাখা যাবে কি না— এসব প্রশ্ন প্রতিনিয়ত তাড়া করে। সেই কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও মেহেরপুর প্রতিদিন ধীরে ধীরে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এটি শুধু একটি সংবাদমাধ্যম নয়, বরং একটি আস্থার নাম হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা, দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন করা, সাধারণ মানুষের সমস্যা তুলে ধরা— এসব দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়। বরং অনেক সময় এই দায়িত্বই হয়ে ওঠে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকিপূর্ণ পথেই সাহসিকতার সঙ্গে হেঁটেছে মেহেরপুর প্রতিদিন। জেলার বিভিন্ন সমস্যা, অবহেলিত মানুষের কষ্ট, স্থানীয় প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা কিংবা সামাজিক অসঙ্গতি— সবকিছুই তারা তুলে ধরেছে নির্ভীকভাবে। ফলে পত্রিকাটি দ্রুতই হয়ে উঠেছে গণমানুষের মুখপত্র।

একটি পত্রিকার প্রকৃত শক্তি তার পাঠকের মধ্যে। যখন পাঠক বিশ্বাস করে— এই পত্রিকা তার কথা বলবে, তার সমস্যাকে গুরুত্ব দেবে, তখনই সেই পত্রিকা সত্যিকারের শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মেহেরপুর প্রতিদিন সেই বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। একটি ছোট্ট গ্রামের কোনো কৃষকের সমস্যা, কোনো শিক্ষার্থীর স্বপ্ন, কোনো নারীর সংগ্রাম— সবকিছুই এই পত্রিকার পাতায় জায়গা পেয়েছে। এটি কেবল সংবাদ পরিবেশন করে না; এটি মানুষের গল্প বলে। কখনো প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে, কখনো আশার আলো জ্বালায়। কোনো একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে যখন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, কোনো সমস্যার সমাধান হয়— তখনই একটি পত্রিকার সার্থকতা পূর্ণতা পায়।

তবে এই পথ সহজ ছিল না। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, অনলাইন মিডিয়ার প্রতিযোগিতা— সবকিছু মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে হয়েছে। বর্তমান সময়ে সংবাদপত্রের জগতে টিকে থাকা মানেই প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলা। সেই চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেছে মেহেরপুর প্রতিদিন। ডিজিটাল যুগে যখন তথ্যের বন্যা, তখন সত্য যাচাই করে নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন করা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। ভুয়া খবরের ভিড়ে সত্যকে আলাদা করে তুলে ধরা— এটি এক ধরনের নৈতিক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করেছে এই পত্রিকাটি। মেহেরপুরের মানুষ যেমন পরিশ্রমী, তেমনি তাদের মনও উদার। তারা ভালোবাসে নিজের মাটি, নিজের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় একটি পত্রিকা যখন তাদের পাশে দাঁড়ায়, তখন সেটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠান থাকে না— এটি হয়ে ওঠে পরিবারের অংশ।

আজ যখন মেহেরপুর প্রতিদিন নবম বছরে পদার্পণ করছে, তখন এটি কেবল একটি বার্ষিকী নয়; এটি একটি যাত্রার মাইলফলক। এই নয় বছর পত্রিকাটিকে শিখিয়েছে কীভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকতে হয়, কীভাবে মানুষের আস্থা অর্জন করতে হয়, কীভাবে সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়—— পলাশীর আম্রকাননে একটি সূর্য অস্ত গিয়েছিল, আর মুজিবনগরের আম্রকাননে আরেকটি সূর্য উদিত হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আজও প্রতিদিন সূর্য ওঠে— সংবাদপত্রের পাতায়, মানুষের কণ্ঠে, সত্যের আলোয়। মেহেরপুর প্রতিদিন সেই আলোরই একটি অংশ। এটি প্রতিদিন নতুন সূর্যোদয়ের বার্তা নিয়ে আসে— সত্যের, সাহসের, ন্যায়বিচারের। আট বছর পার করে এটি প্রমাণ করেছে— ইচ্ছা থাকলে, সাহস থাকলে, দায়বদ্ধতা থাকলে একটি ছোট্ট শহরের পত্রিকাও বড় হয়ে উঠতে পারে মানুষের হৃদয়ে। আগামী দিনের পথ আরও দীর্ঘ, আরও চ্যালেঞ্জিং।

কিন্তু ইতিহাস বলে— যে মাটিতে একবার সূর্য ওঠে, সেই মাটিতে অন্ধকার চিরস্থায়ী হয় না। মেহেরপুরের মাটিও তেমনই। এখানকার প্রতিটি ভোর নতুন সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে আসে। আর সেই সম্ভাবনার সঙ্গী হয়ে, মানুষের পাশে থেকে, সত্যের পথে অটল থেকে— মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে যাবে আরও অনেক দূর। কারণ, এটি শুধু একটি পত্রিকা নয়— এটি একটি প্রতিশ্রুতি, একটি বিশ্বাস, একটি চলমান সূর্যোদয়।

ভাঙাগড়ার রাজনীতি

যেকোনো ভাঙন পরবর্তী সময়ে নতুন এক প্রতিবেশের রূপকল্প জেগে ওঠে। কখনো কখনো বৃত্তচ্যুতির আনন্দ উল্লসিত করে মনকে। কিন্তু সব ভেঙে ফেললেই কি আরাধ্য পৃথিবীর জন্ম হয়?

কি ভাঙবো কতটা ভাঙবো কেন ভাঙবো তার পরিমিতিবোধ বা প্রশ্নও কি জরুরী নয়? ” সবকিছু ভেঙে পড়ে” উপন্যাসে হুমায়ুন আজাদ আমাদের এক মর্মন্তুদ পৃথিবীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। যেখানে তুলে আনা হয়েছে নারী পুরুষের শারীরিক সম্পর্ক ভেঙে পড়ার কাতরতা,; সামাজিক অপরাপর সম্পর্ক ভেঙে পড়ার করুন দৃশ্যপট। বর্তমানে আমরা আজাদের উপন্যাসের মতই এক অসহায় পৃথিবীর বাসিন্দা। যেখানে নিয়তির মতো সবকিছু ভেঙে পড়ছে। সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে, অনাস্থার দোলাচালে মানুষের প্রতি বিশ্বাস ভেঙে পড়ছে, সহাবস্থানের রাজনৈতিক ব্যপ্তি ভেঙে পড়ছে, মানুষের গর্ব দীপ্ত অর্জিত মিনারগুলো ভেঙে পড়ছে, আমাদের আদর্শিক অর্জিতের ৭১ ও ৭১ পরবর্তী সময়শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে।ভাঙাটাই কি সৃষ্টি? ভাঙ্গন পরবর্তী কি কোনো সৃষ্টি হচ্ছে বা হয়েছে?

২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভেঙে পড়ল স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ত্রাসন। চেতনার ভিত্তির উপর দাঁড় করানো ক্ষমতা ভেঙে পড়ল। ঐতিহাসিক ৩২, স্বোপার্জিত স্মৃতির মিনার, কবর, বাউলের আখড়া বাড়ি ভেঙে পড়ল, চেতনার তীব্র বধের ফলায় ভেঙে ফেলা হলো আরেক চেতনা। এখানে টিকে থাকার বিকল্প হিসেবে আদিম উপায় গুলোকে ব্যবহার করা হলো ইচ্ছে মতো। ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পর মোটাদাগে শুরু হলো চেতনা বনাম চেতনার লড়াই। ব্যক্তি ব্যর্থতার দায় চেপে গেল ৫২ ৬৬ ৬২ ৬৯ ৭১ এর কাঁধে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হলো ইতিহাসের শরীর। এখন নতুন ইতিহাসের অভূতপূর্ব জন্মভার বইছে বাংলাদেশ। যেখানে লেখা হতে চলেছে দায়মুক্তির এক নতুন ইতিহাস। কিসের দায়মুক্তি? এই দেশ নাকি ভুল ইতিহাসের লজ্জার ফসল। তাই ইতিহাস মেরামতের কাজ চলছে।

মানুষকে মিথ্যা ইতিহাসের বাতাবরণ থেকে মুক্তি দিতে এখানে ইতিহাসের স্কুল চালু হয়েছে। চেনা ৭১ কে নতুনভাবে চেনানো হচ্ছে। একাত্তরকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে; শহীদের প্রকৃত সংখ্যা বিতর্ক তুলে; স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্কের কবিয়াল লড়াই শুরু করে, মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি ভেঙে দেয়ার কাজ চলছে। মহান

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্থাপত্যের মূর্ত প্রতীক মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স। ৫ই আগস্ট এর হাতুড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে তার তিন শতাধিক ভাস্কর্য। শাহজাদপুরে রবি ঠাকুরের কাছারিবাড়ীর স্মৃতিচিহ্ন, ছায়ানোটির সংগ্রহশালা। কি দোষ সেগুলোর? দোষ একটাই নতুন ইতিহাস সৃষ্টির পথে অন্তরায় এগুলো। তাই ভাঙো এবং ভেঙে ফেলো। তোমরাই তো ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান, সভ্যতার অনিবার্য অংশ। উপহার হিসেবে তোমার মাথায় দেওয়া হবে দায়মুক্তির মুকুট ।

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স এর ভাস্কর্য গুলো অনল বর্ষী ইতিহাসের স্মারক। মহান মুক্তিযুদ্ধকে একচিলতে মানচিত্রে তুলে আনার নিপুণ শিল্পকর্ম। এখন এমন এক বিপন্ন সময়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। যেখানে কোন শক্ত প্রতিবাদ গড়ে ওঠেনি। দুর্বৃত্তদের আইনের আওতায় আনতে কোন আইনি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়নি। দেশজুড়ে এই ভাঙনদূর্বৃত্তির মূলে রয়েছে ইতিহাসকে মুছে ফেলার সুক্ষ নকশা।

কিন্তু ভাঙলেই কি মোছা যায়৷ ইতিহাসের মজ্জাগত ক্রমধারা। যা ধাবিত হয়ে চলেছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম। ইতিহাস নদীর মতোই ধাবমান। শত বাধা পেরিয়ে আপন পথ সে ঠিকই খুঁজে নেয়। সন্দেহ নেই এখন ভাঙাটাই সৃষ্টি। কিন্তু তার আগে গড়ে তোলার জন্য চাই উপযুক্ত উপকরণ। তবেই গড়ে উঠবে আগামীর বাসযোগ্য পৃথিবী। দেয়াল তুললেই কেবল ঘর নয় সৃষ্টি হতে পারে আয়নাঘরও।

সাংবাদিকতার দায়: পক্ষ, বিপক্ষ, নিরপেক্ষ

সাংবাদিকতাও কি একটি পেশা?

পেটের দায়ে তো মানুষ কত কিছুই করে, প্রচলিত পেশার মধ্যে কুলিয়ে উঠতে না পেরে কেউ কেউ নতুন নতুন পেশার উৎসমুখ নিজে থেকেই খুলে নেন, নতুন খাতে পেশাগত দক্ষাতা রচনা করেন, নতুন পেশাকে জনপ্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হন এবং বহু গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টায় ওই পেশার কাঠমোগত রূপরেখা দাঁড় করিয়ে নেন। ওই পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারটাও জরুরি হয়ে

ওঠে। গোড়াতে ধর্মপ্রচারের কাজটি অবৈতনিক স্বেচ্ছাশ্রমের কাজ তথা ‘ ব্রত’ বলে গণ্য হলেও দিনে দিনে তারও পেশাগত আদল দাঁড়িয়ে গেছে। মসজিদের ইমাম কিংবা মুয়াজ্জিনের জন্যেও বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করে তবেই নিয়োগ দেয়া হয়।

বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে বক্তৃতার জন্যে বড় বড় আলেম মওলানা স্বনির্ধারিত ফি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে তারপর মঞ্চে ওঠেন। ওখন অর্থের চোরাগলিতে নিভৃতে মুখ লুকায় ধর্মপ্রচারের মহান ব্রত। আল্টিমেটলি ব্যাপারটা পেশা হিসেবেই দাঁড়িয়ে যায়। আর মসজিদ-মাদ্রাসা-ধর্মসভার জন্যে চাঁদা আদায়কারীর মাথায় টপি, মুখে দাড়ি এবং ধর্মের বুলি থাকলেও এখান থেকে নির্দিষ্ট হারে কমিশন ভোগ করাকেই তিনি জীবিকা নির্বাহের উপায় বা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। একটু চেপে ধরলেই তাঁরা সরল সত্যটুকু সহজেই কবুল করেন— তাঁদেরও ঘরসংসার আছে, পেটের দায় আছে। তা বটে। প্রাণী মাত্রেরই পেট আছে। পেটের চিন্তা আছে। নির্দিষ্ট পেশা থাকাটাও খুবই সঙ্গত ও প্রত্যাশিত। নানাভাবে ঘাটাঘাটি করতে করতে মানুষ একটা পেশাতে থিতু হয়ে দাঁড়াতে চায়। তাই বলে কি সাংবাদিকতাকেও পেশা বলতে হবে?

তা যদি বলতে হয় তাহলে এই পেশটির রূপরেখা, যোগ্যতা- ব্যর্থতা, বেতন ও সুযোগ সুবিধার সব দিক খোলাসা এবং স্বচ্ছ হওয়াও জরুরি। স্বাধীন সাংবাদিকতার নামে সাংবাদিকের স্বেচ্ছাচারিতা যেমন কাম্য নয়, এ পেশায় যুক্ত সবার জন্য অনুসরণীয় ও পালনীয় নীতিমালার বাস্তবায়নে গড়িমসিও তেমনই কাম্য নয়। ওয়েজ বোর্ডের নীতিমালার কথা শোনা যায় বটে, তা কত দূর পর্যন্ত কার্যকর আছে, সেটা দেখভালের আদৌ কোনো কর্তৃপক্ষ আছে?

সাংবাদিকদের নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়। আদর্শের কথা শোনানো হয়। পেশা নয়, সাংবাদিকতাকে পবিত্র ব্রত বলে মহান করেও তোলা হয়। কিন্তু সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকেরা ঘরের খেয়ে আর কত বনের মোষ তাড়াবে, সে কথা স্পষ্ট করে কেউ বলে না। কথায় কথায় তাদের বিপথগামিতার কথাও কেউ কেউ বলেন। তারা কি ভেবে দেখেছেন- রাষ্ট্রের অব্যবস্থাপনাই কি তাদের বিপথে ঠেলে দিচ্ছে না? হলুদ সাংবাদিকতার কথাও ওঠে কখনো কখনো। কথিত এই হলুদ সাংবাদিকতা অবশ্যই নিন্দনীয়, কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছেন কি-কেন এ পথে গেল একজন সাংবাদিক? অস্বচ্ছ রাজনীতির ঘোলাজলে পা ডুবিয়ে যারা কালো টাকার পাহাড় গড়েন এবং সেই কালো টাকা সাদা করার ফন্দি থেকে গড়ে তোলেন মিডিয়া হাউজ, তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় ও মদদে হলুদ

সাংবাদিকতা প্রশ্রয় পায়; কই তাদের বেলায় তো এ সমাজ কোনো প্রশ্ন তোলে না। বরং চোখ বন্ধ রেখে প্রকারান্তরে তাদেরই সমর্থন জানায়। আর যত দোষ হয় সাংবাদিকের।

প্রশ্ন ওঠে সাংবাদিকের নিরপেক্ষতা নিয়ে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ভালো ঘটনা যেমন ঘটে, মন্দ ঘটনাও অনেক ঘটে চলেছে। একই ঘটনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করলে এক রকম পরিবেশন ঘটে, নেতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করলে হয় অন্যরকম। সুসংবাদ বা ভালো ঘটনা যতটা নিউজ ভ্যালু পায়, মন্দঘটনা বা দুঃসংবাদ তার চেয়ে বেশি কাভারেজ পায় সাংবাদিকতায়। এ সব ক্ষেত্রে এই যে অদৃশ্য পোষকতা তা-ই অনেক সময় সাংবাদিককে অনিরপেক্ষতার দিকে ঠেলে দেয়। গণবিচ্ছিন্ন অশুভ রাজনীতি আছে সব নষ্টের মূলে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-সমূহকে নিরপেক্ষ ভূমিকায় থাকতে দেয় না শুধু তাই নয়, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সরকারি অফিস-আদালত পর্যন্ত অনিরপেক্ষ করে তোলে যাঁরা, তারা তো সাংবাদিককেও যে-কোনো মূল্যে পেতে চায় তাদের পক্ষেই। বক্তৃতায় নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার বুলি আওড়ালেও বিবদমান তালগাছটি তারা পেতে চায় নিজেদের ভাগে এবং সাংবাদিকদেরও রাখতে চায় নিজেদের পক্ষে। প্রকৃতপক্ষে সাংবাদিকদের প্রতিনিয়ত লড়তে হয় এই অপশক্তির অক্টোপাসের মুখে দাঁড়িয়ে। বিশেষত মফস্বল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মেরুদন্ড শক্ত করে নিরপেক্ষ অবস্থানে দৃঢ় থাকা সত্যিই কঠিন।

তবে এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না যে অনেকেই পথ ভুলে চলে এসেছেন সাংবাদিকতার পবিত্র আঙিনায়। সাংবাদিক হয়ে ওঠার পূর্ব প্রস্তুতি যেমন নেই তাদের বুকের ভেতরে বড় কোনো অঙ্গীকারও নেই। ফলে ভুল ঠিকানায় ঘুরে ঘুরে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই আঙিনার পবিত্রতা নষ্ট করে চলেছে, নিজেদেরও নামিয়ে আনছে অসম্মানের শেষ স্তরে। আড়ালে আবডালে নয়, সাংবাদিক দেখে কেউ কেউ প্রকাশ্যেও ‘সাংঘাতিক’ বলে

পরিহাস করে এবং কী আশ্চর্য ঘটনা — এমন আপত্তিকর মন্তব্য বেশ হজমও করে মুখ বুজে। এদের দিকে আঙুল তুলে গোটা সাংবাদিক সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার এই অশুভ প্রক্রিয়া রুখতে হলে অপ-সাংবাদিকদের সনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্হা নিতে হবে শুভবোধসম্পন্ন দায়িত্বশীল সাংবাদিকদেরই। অপ্রিয় এই ক্ষেত্রেও দায় নিতে সাংবাদিকদের।

দীর্ঘকালের অপশাসন এ দেশের সাধারণ মানুষের মনে যে আস্থাহীনতা তৈরি করেছে তা খুবই ভয়াবহ। মানুষ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে

নির্বাচনে মেতে ওঠে, তারপর অচিরেই টের পায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তার কথা বলে না, তার ন্যায্য দাবির সঙ্গে সংহতি জানায় না।

সরকারি অফিস-আদালতের সব দুয়ারেও তার সমান অধিকার নেই। তাহলে সে দাঁড়াবে কোথায়, কোন ভরসায়? আশাহত এই সব মানুষের প্রাণের স্পন্দন তথা জীবনের ভাষা বুঝতে হবে সাংবাদিকদের। দাঁড়াতে হবে এই সব মানুষের পাশে। তাদের বুকে জাগাতে হবে ভরসা। ঋষিসুলভ উদাসীনতা বা তথাকথিত নিরপেক্ষতার মুখোশে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা নয়, এ দেশেরই সন্তান হিসেবে এক-পা এগিয়ে এসে গণমানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবির কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশের দায় কাঁধে নিতে হবে সাংবাদিকদের। এই পক্ষপাতিত্বের মধ্যেই নিহিত আছে পবিত্রতম নিরপেক্ষতা। চারণ সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ, জলধর সেন, একালের সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দীন, প্রবীর সাহা আমাদের সেই পথেরই সন্ধান দিয়েছেন।

বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক।